তৈল

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী

তৈল যে কি পদার্থ, তাহা সংস্কৃত কবিরা কতক বুঝিয়াছিলেন। তাঁহাদের মতে তৈলের অপর নাম স্নেহ। বাস্তবিকও স্নেহ ও তৈল একই পদার্থ। আমি তোমায় স্নেহ করি, তুমি আমায় স্নেহ কর অর্থাৎ আমরা পরস্পরকে তৈল দিয়া থাকি। স্নেহ কি? যাহা স্নিগ্ধ বা ঠান্ডা করে, তাহার নাম স্নেহ। তৈলের ন্যায় ঠাণ্ডা করিতে আর কিসে পারে?

সংস্কৃত কবিরা ঠিকই বুঝিয়াছিলেন। যেহেতু তাহারা সকল মনুষ্যকেই সমানরূপে স্নেহ করিতে বা তৈল প্রদান করিতে উপদেশ দিয়াছেন।

বাস্তবিকই তৈল সর্বশক্তিমান; যাহা বলের অসাধ্য, যাহা বিদ্যার অসাধ্য, যাহা ধনের অসাধ্য, যাহা কৌশলের অসাধ্য,তাহা কেবল একমাত্র তৈল দ্ধারা সিদ্ধ হইতে পারে। যে সর্বশক্তিময় তৈল ব্যবহার করিতে জানে,সে সর্বশক্তিমান। তাহার কাছে জগতের সকল কাজই সোজা। তাহার চাকরির জন্য ভাবিতে হয় না – উকীলিতে পসার করিবার জন্য সময় নষ্ট করিতে হয় না, বিনা কাজে বসিয়া থাকিতে হয় না, কোন কাজেই শিক্ষানবিশ থাকিতে হয় না।যে তৈল দিতে পারিবে,তাহার বিদ্যা না থাকিলেও সে প্রফেসার হইতে পারে। আহাম্মুক হইলেও ম্যাজিষ্ট্রেট হইতে পারে, সাহস না থাকিলেও সেনাপতি হইতে পারে এবং দুর্লভরাম হইয়াও উড়িষ্যার গভর্ণর হইতে পারে।

তৈলের মহিমা অতি অপরূপ ।তৈল নহিলে জগতের কোন কাজ সিদ্ধ হয় না ।তৈল নহিলে কল চলে না, প্রদীপ জ্বলে না, ব্যঞ্জন সুস্বাদু হয় না, চেহেরা খোলে না, হাজার গুন থাকুক তাহার পরিচয় পাওয়া যায় না, তৈল থাকিলে তাহার কিছুরই অভাব থাকে না।

সর্বশক্তিময় তৈল নানারূপে সমস্ত পৃথিবী ব্যাপ্ত করিয়া আছেন। তৈলের যে মূর্তিতে আমরা গুরুজনকে স্নিগ্ধ করি, তাহার নাম ভক্তি,যাহাতে গৃহিণীকে স্নিগ্ধ করি,তাহার নাম প্রণয়; যাহাতে প্রতিবেশীকে স্নিগ্ধ করি,তাহার নাম মৈত্রী; যাহা দ্ধারা সমস্ত জগৎকে স্নিগ্ধ করি,তাহার নাম শিষ্টাচার ও সৌজন্য “ফিলনথপি।”যাহা দ্ধারা সাহেবকে স্নিগ্ধ করি তাহার নাম লয়েলটি ;যাহা দ্ধারা বড়লোককে স্নিগ্ধ করি, তাহার নাম নম্রতা বা মডেষ্টি ।চাকর বাকর প্রভৃতিকেও আমরা তৈল দিয়া থাকি, তাহার পরিবর্তে ভক্তি বা যত্ন পাই ।অনেকের নিকট তৈল দিয়া তৈল বাহির করি।

পরস্পর ঘর্ষিত হইলে সকল সকল বস্তুতেই অগ্ন্যুদ্গম হয়। অগ্ন্যুদ্গম নিবারণের একমাত্র উপায় তৈল ।এইজন্যই রেলের চাকায় তৈলের অনুকল্প চর্বি দিয়া থাকে। এইজন্যই যখন দুজনে ঘোরতর বিবাদে লঙ্কাকাণ্ড উপস্থিত হয় ,তখর রফা নামক তৈল আসিয়া উভয় ঠাণ্ডা করিয়া দেয় ।তৈলের যদি অগ্নিনিবারণী

শক্তি না থাকিত, তবে গৃহে গৃহে গ্রামে গ্রামে পিতাপুত্রে স্বামী-স্ত্রীতে রাজায়-প্রজায় বিবাগ বিসম্বাদে নিরন্তর অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইত। পূর্বেই বলা গিয়াছে, যে তৈল দিতে পারে, সে সর্বশক্তিমান,কিন্তু তৈল দিলেই হয় না। দিবার পাত্র আছে,সময় আছে,কৌশল আছে।

তৈল দ্ধারা অগ্নি পর্যন্ত বশতাপন্ন হয়। অগ্নিতে অল্প তৈল দিয়া সমস্ত রাত্রি ঘরে আবদ্ধ রাখা যায় । কিন্তু সে তৈল মূর্তিমান্।

কে যে তৈল দিবার পাত্র নয়, তাহা বলা যায় না। পুঁটে তেলি হইতে লাটসাহেব পর্যন্ত তৈল দিবার পাত্র। তৈল এমন জিনিষ নয় যে,নষ্ট হয়। একবার দিয়া রাখিলে নিশ্চয়ই কোন না কোন ফল ফলিবে। কিন্তু তথাপি যাহার নিকট উপস্থিত কাজ আদায় করিতে হইবে, সেই তৈলনিষেধের প্রধান পাত্র। সময় – যে সময়েই হউক, তৈল দিয়া রাখিলেই কাজ হইবে। কিন্তু উপযুক্ত সময়ে অল্প তৈলে অধিক কাজ হয়।

কৌশল – পূর্বেই উল্লেখ করা গিয়েছে, যেরূপেই হউক, তৈল দিলে কিছু না কিছু উপকার হইবে। যেহেতু তৈল নষ্ট হয় না, তথাপি দিবার কৌশল আছে। তাহার প্রমাণ ভট্টাচার্যেরা সমস্ত দিন বকিয়াও যাহার নিকট পাঁচ সিকা বৈ আদায় করিতে পারিল না, একজন ইংরেজিওয়ালা তাহার নিকট অনায়াসে ৫০ টাকা বাহির করিয়া লইয়া গেল। কৌশল করিয়া এক বিন্দু দিলে যত কাজ হয়, বিনা কৌশলে কলস কলস ঢালিলেও তত হয় না।

ব্যক্তিবিশেষে তৈলের গুনতারতাম্য অনেক আছে। নিষ্কৃত্রিম তৈল পাওয়া অতি দুর্লভ। কিন্তু তৈলের এমনি একটি আশ্চর্য সম্মিলনীশক্তি আছে যে, তাহাতে যে উহা অন্য সকল পদার্থের গুনই আত্নসাৎ করিতে পারে। যাহার বিদ্যা আছে,তাহার তৈল আমার তৈল হইতে মূল্যবান। বিদ্যার উপর যাহার বুদ্ধি আছে,তাহার আরও মূল্যবান।তাহার উপর যদি ধন থাকে, তবে তাহার প্রতি বিন্দুর মূল্য লক্ষ টাকা। কিন্তু তৈল না থাকিলে তাহার বুদ্ধি থাকুক,হাজার বিদ্যা থাকুক, হাজার ধন থাকুক, কেহই টের পায় না।
তৈল দিবার প্রবৃত্তি স্বাভাবিক। এ প্রবৃত্তি সকলেরই আছে এবং সুবিধামত আপন গৃহে ও আপন দলে সকলেই ইহা প্রয়োগ করিয়া থাকে, কিন্তু অনেকে এত অধিক স্বার্থপর, বাহিরের লোককে তৈল দিতে পারে না।তৈলদান প্রবৃত্তি স্বাভাবিক হইলেও উহাতে কৃতকার্য হওয়া অদৃষ্টসাপেক্ষ।

আজকাল বিজ্ঞান, শিল্প প্রভৃতি শিখাইবার জন্য নানাবিধ চেষ্টা চলিতেছে।যাহাতে বঙ্গের লোক প্রাকটিক্যাল অর্থাৎ কাজের লোকের হইতে পারে; তজ্জন্য সকলেই সচেষ্ট, কিন্তু কাজের লোক হইতে হইলে তৈলদান সকলের আগে দরকার। অতএব তৈলদানের একটি স্কুলের নিতান্ত প্রয়োজন। অতএব আমরা প্রস্তাব করি, বাছিয়া বাছিয়া কোন রায়বাহাদুর অথবা খাঁ বাহাদুরকে প্রিন্সিপাল করিয়া শীঘ্র একটি স্নেহ-নিষেধের কালেজ

খোলা হয় । অন্ততঃ উকীলি শিক্ষার নিমিত্ত ল’ কালেজে একজন তৈল অধ্যাপক নিযুক্ত করা আবশ্যক। কালেজ খুলিতে পারিলে ভালই হয়।

কিন্তু এরূপ কালেজ খুলিতে হইলে প্রথমতই গোলযোগ উপস্থিত হয়। তৈল সবাই দিয়া থাকেন – কিন্তু কেহই স্বীকার করেন না যে, আমি দেই। সুতরাং এ বিদ্যার অধ্যাপক জোটা ভার। এ বিদ্যা শিখিতে হইলে দেখিয়া শুনিয়া শিখিতে হয়। রীতিমত লেকচার পাওয়া যায় না। যদিও কোন রীতিমত কালেজ নাই, তথাপি যাঁহার নিকট চাকরীর বা প্রমোশনের সুপারিস মিলে, তাদৃশ লোকের বাড়ী সদাসর্বদা গেলে উত্তমরূপ শিক্ষালাভ করা যাইতে পারে ।বাঙালীর বল নাই, বিক্রম নাই, বিদ্যাও নাই, বুদ্ধিও নাই। সুতরাং বাঙালীর একমাত্র ভরসা তৈল – বাঙালীর যে কেহ কিছু করিয়াছেন, সকলই তৈলের জোরে, বাঙালীদিগের তৈলের মূল্য অধিক নয়; এবং কি কৌশলে সেই তৈল বিধাতৃপুরুষদিগের সুখসেব্য হয়, তাহাও অতি অল্পলোক জানেন। যাঁহারা জানেন,তাঁহাদিগকে আমরা ধন্যবাদ দিই। তাঁহারাই আমাদের দেশের বড় লোক, তাঁহারাই আমাদের দেশের মুখ উজ্জ্বল করিয়া আছেন।

তৈল বিধাতৃপুরুষদিগের সুখসেব্য হইবে, ইচ্ছা করিলে সে শিক্ষা এদেশে হওয়া হওয়া কঠিন। তজ্জন্য বিলাত যাওয়া আবশ্যক। তত্রত্য রমণীরা এ বিষয়ের প্রধান অধ্যাপক, তাহাদের ধ্রু হইলে তৈল শীঘ্র কাজে আইসে।

শেষে মনে রাখা উচিত, এক তৈলে চাকাও ঘোরে আর তৈলে মনও ফেরে।

লেখক পরিচিতি

ভারতের এক বিদ্যাজীবী পরিবারের সফল উত্তরাধিকার হরপ্রসাদ শাস্ত্রী (জন্ম : চব্বিশপরগনার নৈহাটি, ৬ ডিসেম্বর ১৮৫৩; মৃত্যু : ১৭ নভেম্বর ১৯৩১)। তার প্রকৃত নাম শরৎনাথ ভট্টাচার্য। শৈশবে ‘হর’ বা শিবের প্রসাদে জটিল অসুস্থতা থেকে সেরে ওঠায় নাম বদলে রাখা হয় হরপ্রসাদ। পরবর্তী সময়ে সংস্কৃত ভাষা-সাহিত্যে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকারসহ স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করায় ‘শাস্ত্রী’ উপাধী লাভ করেন। হরপ্রসাদ একাধারে শিক্ষাবিদ, গবেষক, বহুভাষাবিদ, পুঁথি-সংগ্রাহক-বিশ্লেষক-সম্পাদক, অনুবাদক, শিলালেখ ও তাম্রলিপির পাঠোদ্ধারকারী এবং ঐতিহাসিক। তার সম্পাদিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ প্রকাশিত ‘হাজার বছরের বাঙ্গালা ভাষার বৌদ্ধ গান ও দোহা’ (প্রকাশকাল : ১৯১৬)। বাংলাসাহিত্যের সবচেয়ে প্রাচীন নিদর্শন হিসেবে পরিচিত এই ‘চর্য্যাচর্য্য বিনিশ্চয়’ বা ‘চর্যাপদ’ ১৯০৭ সালে নেপাল থেকে হরপ্রসাদই আবিষ্কার করেন। বাংলাসাহিত্য যে হাজার বছরের পুরনো, তা হরপ্রসাদের এই আবিষ্কারের পথ ধরেই প্রমাণিত হয়। গবেষণা এবং পুঁথি-আবিষ্কার ও সম্পাদনা ছাড়াও তিনি উপন্যাস লিখেছেন (‘কাঞ্চনমালা’, ১৯১৬; ‘বেনের মেয়ে’, ১৯২০); কয়েকজন প্রাচীন মনীষীর জীবন ও কর্মের ইতিবৃত্ত রচনা করেছেন; মাইকেল মধুসূদন দত্তের ‘মেঘনাদবধ কাব্য’-এর নাট্যরূপ দিয়েছেন।

বিশ্লেষণ

একথা সম্ভবত সবাই মানবেন যে, বুদ্ধি থাকলেও সাধারণত সাধনার প্রমাণ বাঙালি রাখতে পারে না। আমরা কম শিখে বেশি লাভ করতে চাই। অবশ্য অল্পকিছু ব্যতিক্রম মাঝে মধ্যে চোখে পড়ে। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী তেমনই এক অনন্য সাধক। সাধনা দিয়ে জ্ঞান অর্জন করা চলে বটে, কিন্তু তাকে সহজ করে অনুধাবন করা এবং প্রকাশ করা সাধারণ ব্যাপার নয়। লক্ষ্যণীয় বিষয়, দার্শনিকশক্তির বলে হরপ্রসাদ বাবু অর্জিত জ্ঞান, চিন্তা ও প্রকাশের সরলতার কারণে নিজের ও অপরের জন্য সহজ করে তুলতে পেরেছেন। প্রবন্ধের ভাষায় এবং পরিবেশনশৈলীতে তার প্রাতিস্বিকতা পাঠকের নজর কাড়ে। 'তেল' (প্রথম প্রকাশ : 'বঙ্গদর্শন', চৈত্র ১২৮৫) প্রবন্ধটিতে বিশেষভাবে পাঠকের অভিনিবেশ প্রতিফলিত হয়েছে। এ প্রবন্ধে মননশীলতার পাশাপাশি সৃজনশীলতার প্রকাশও ঘটেছে। লেখক তার সামাজিক অভিজ্ঞতা থেকে মানুষের মানচিত্র তুলে ধরেছেন বর্তমান প্রবন্ধটিতে। রচনাটির আরম্ভ এরকম-

তৈল যে কী পদার্থ তাহা সংস্কৃত কবিরা কতক বুঝিয়াছিলেন, তাহাদের মতে তৈলের অপর নাম স্নেহ বাস্তবিক স্নেহ ও তৈল একই পদার্থ। আমি তোমায় স্নেহ করি, তুমি আমায় স্নেহ কর, অর্থাৎ আমরা পরস্পরকে তৈল দিয়া থাকি। স্নেহ কী? যাহা স্নিগ্ধ বা ঠাণ্ডা করে তাহার নাম স্নেহ। তৈলের ন্যায় ঠাণ্ডা করিতে আর কিসে পারে!

মানুষ মানুষকে স্নেহ করবে, শ্রদ্ধা করবে, ভালোবাসবে এটাই স্বাভাবিক। কাজেই চিন্তাবিদদের চোখে স্নেহ বা ভিন্নার্থে তৈল আদান-প্রদান কোনো খারাপ বস্তু নয়। কিন্তু খুবই পরিতাপের বিষয়, সমাজ রূপান্তরের পরিক্রমায় 'তেল' শব্দটির প্রয়োগ নেতিবাচক অর্থে প্রচলিত হয়েছে। কেননা, মানুষের সন্তুষ্টি অর্জনে যেখানে শক্তি-বিদ্যা-ধন-কৌশল প্রভৃতি কোনো কাজে আসে না, তখন 'তেল' বেশ কাজ দেয়। 'তেল' শব্দটির এখানে তাৎপর্যগত অর্থ দাঁড়ায় মিথ্যা প্রশংসা বা লোক দেখানো স্তুতি। তার মানে, স্নেহ বা শ্রদ্ধা তার চরিত্র হারিয়ে মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করলে তা 'তেল' হিশেবে বিবেচিত হয়ে থাকে। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী যাপিত-জীবনে অবলোকন করেছেন : 'বাস্তবিকই তেল সর্বশক্তিমান। ... যে সর্বশক্তিময় তৈল ব্যবহার করিতে জানে, সে সর্বশক্তিমান। তাহার কাছে জগতের সব কাজই সোজা, তাহার চাকরির জন্য ভাবিতে হয় না- উকিলিতে প্রসার করিবার জন্য সময় নষ্ট করিতে হয় না বিনা কাজে বসিয়া থাকিতে হয় না, কোনো কাজেই শিক্ষানবিশ থাকিতে হয় না। যে তৈল দিতে পারিবে তাহার বিদ্যা না থাকিলেও সে প্রফেসর হইতে পারে, আহাম্মক হইলেও ম্যাজিস্ট্রেট হইতে পারে, সাহস না থাকিলেও সেনাপতি হইতে পারে এবং দুর্লভরাম হইয়াও উড়িষ্যার গভর্নর হইতে পারে।' প্রসঙ্গত, প্রাবন্ধিক উপহাসাকিভাবে প্রকাশ করেছেন, 'তেল প্রদান'-এর 'মহিমা' ও 'অপরূপতা'র কথা। সামাজিকভাবে তেলের ব্যবহার-যোগ্যতাও তুলে ধরেছেন বর্ণনা সূত্রে। কলকারখানা পরিচালনা, প্রদীপ-জ্বালনা, তরকারি রান্না, চেহারার সৌন্দর্য বৃদ্ধি প্রভৃতি কাজে যে তেলের প্রয়োগ অনিবার্য, তা-ও পাঠককে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। আর তেলের নানান রূপ ও নাম বিষয়েও নাতিদীর্ঘ একটি তালিকা প্রস্তুত করেছেন দার্শনিক-প্রাবন্ধিক হরপ্রসাদ। আসুন, দেখে নেওয়া যাক 'তেল'-এর বহুবিধ পরিচয় ও নামাবলী :

সর্বশক্তিময় তেল নানারূপে সব পৃথিবী ব্যাপ্ত করিয়া আছেন। তেলের যে মূর্তিতে আমরা গুরুজনকে স্নিগ্ধ করি তাহার নাম ভক্তি, যাহাতে গৃহিণীকে স্নিগ্ধ করি তাহার নাম প্রণয়, যাহাতে প্রতিবেশীকে স্নিগ্ধ করি তাহার নাম মৈত্রী, যাহা দ্বারা জগৎকে স্নিগ্ধধ করি তাহার নাম শিষ্টাচার ও সৌজন্য 'ফিলিনথ্রপি'। যাহা দ্বারা সাহেবকে স্নিগ্ধ করি তাহার নাম লয়্যালটি, যাহা দ্বারা বড়লোককে স্নিগ্ধ করি তাহার নাম নম্রতা বা মডেস্টি। চাকর-বাকর প্রভৃতিকেও আমরা তেল দিয়া থাকি, তাহার পরিবর্তে ভক্তি বা যত্ন পাই। অনেকের কাছে তেল দিয়া তেল বাইর করি।

বিজ্ঞান বলে, বস্তুর সঙ্গে বস্তুর ঘর্ষণে আগুনের উৎপত্তি। আর সে আগুন উৎপাদন ঠেকাতে মহৌষধ হিসেবে কাজ করে তেল। তাই মেশিন প্রভৃতিতে তেল প্রয়োজন পড়ে। এসব যুক্তিতর্কাদি পরিবেশন করে পণ্ডিত হরপ্রসাদ বুঝাতে চেয়েছেন যে, দুই পক্ষের বিবাদ সামাল দিতে দরকার হয় 'তেল'। তার মতে, 'তৈলের যদি অগ্নিনিবারণী শক্তি না থাকিত তবে গৃহে-গৃহে, গ্রামে-গ্রামে, পিতা-পুত্রে, স্বামী-স্ত্রীতে, রাজায়-প্রজায় বিবাদ-বিসংবাদে নিরন্তর অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইত।' সমাজের সব শ্রেণীর লোক 'তেল' লাভের প্রতীক্ষায় থাকে। এখানে কোনো ধনী-গরিব, চাকর-মালিক প্রভেদ নেই। তবে তেল প্রয়োগের উপযুক্ত প্রতিবেশ ও সময়টা বুঝতে হয়। এজন্য তেল প্রদানের সঙ্গে কৌশলের সম্পর্কে লেখক অস্বীকার করতে পারেননি। তিনি জানেন, 'কৌশল করিয়া একবিন্দুও দিলে যত কার্য হয়, বিনা কৌশলে কলস কলস ঢালিলেও তত হয় না।' ঐতিহাসিক ও সমাজ বিশ্লেষক হরপ্রসাদ শাস্ত্রী আরও জানাচ্ছেন :

ব্যক্তিবিশেষে তেলের গুণতারতম্য অনেক আছে। নিষ্কৃত্রিম তৈল পাওয়া অতি দুর্লভ। কিন্তু তৈলের এমনি একটি আশ্চর্য সম্মিলনী শক্তি আছে যে, তাহাতে উহা অন্য সব পদার্থের গুণই আত্মসাৎ করিতে পারে। যাহার বিদ্যা আছে তাহার তৈল আমার তৈল অপেক্ষা মূল্যবান। বিদ্যার ওপর যাহার বুদ্ধি আছে তাহার আরও মূল্যবান। ... তেল দেয়ার প্রবৃত্তি স্বাভাবিক। এ প্রবৃত্তি সবারই আছে এবং সুবিধামতো আপন গৃহে ও আপন দলে সবাই ইহা প্রয়োগ করিয়া থাকে; কিন্তু অনেকে এত অধিক স্বার্থপর যে, বাইরের লোককে তেল দিতে পারে না। তেলদান প্রবৃত্তি স্বাভাবিক হইলেও উহাতে কৃতকার্য হওয়া অদৃষ্টসাপেক্ষ।

আমরা জানি, শিল্পকলা-বিজ্ঞান-প্রযুক্তি এবং নানা চিন্তাবিদ্যার প্রসার ঘটেছে পৃথিবীময়। আবেগময়তা ছেড়ে মানুষ প্রায়োগিক জীবনের বাস্তবতার দিকে অগ্রসর হয়েছে। পরিবর্তিত হয়েছে শিক্ষাপ্রদান ও গ্রহণের পদ্ধতি ও কাঠামো। তবে প্রাতিষ্ঠানিক জ্ঞানের বাইরে যে অপ্রাতিষ্ঠানিক জ্ঞান, বিশেষ করে 'তেল' প্রদান এবং ছলা-কলার প্রশিক্ষণ-প্রক্রিয়া প্রচলিত রয়েছে, সে ব্যাপারে সামাজিক স্বীকৃতি-অস্বীকৃতির কথা বলতে গিয়ে সামান্য বাঁকা সুর পরিবেশন করেছেন লেখক। এই 'বিশেষ সামাজিক শিক্ষা' সম্পর্কে সত্যান্বেষী হরপ্রসাদ বলেছেন : 'তেলদানের একটি স্কুলের নিতান্ত প্রয়োজন। অতএব আমরা প্রস্তাব করি বাছিয়া বাছিয়া কোনো রায়বাহাদুর অথবা খাঁ বাহাদুরকে প্রিন্সিপাল করিয়া শিগগির একটি স্নেহনিষেকের কালেজ খোলা হয়। ... কিন্তু এরূপ কালেজ খুলিতে হইলে প্রথমতই গোলযোগ উপস্থিত হয়। তেল সবাই দিয়া থাকেন- কিন্তু কেহই স্বীকার করেন না যে, আমি দিই। সুতরাং এ বিদ্যার অধ্যাপক জোটা ভার, এ বিদ্যা শিখিতে হইলে দেখিয়া শুনিয়া শিখিতে হয়। রীতিমতো লেকচার পাওয়া যায় না।' বল-বিক্রম-বিদ্যা-বুদ্ধিবিহীন বাঙালির একমাত্র

ভরসা যে ‘তৈলমর্দন’, সে-বিষয়ে হরপ্রসাদ কোনো সন্দেহ পোষণ করেননি। আবার তেল-প্রয়োগ পদ্ধতিও যেসব বাঙালি সঠিকভাবে আয়ত্ত করতে পারেনি, তাও তিনি তার পাঠককে মনে করিয়ে দিয়েছেন। যশ-খ্যাতি যাই বলি না কেন, বাঙালির সমূহ সাফল্যের মূলে যে ওই ‘তৈল’ তা যাপিত-জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে, প্রতিদিনের প্রতিবেশ থেকে জেনেছেন সমাজ-বিশ্লেষক হরপ্রসাদ। আর ‘তেল’-প্রয়োগ বিদ্যায় ‘বিলাতি’ ডিগ্রি (বিদেশপ্রিয়তা বুঝাতে!) কিংবা মাধ্যম হিসেবে ‘নারীকে ব্যবহার’ করতে পারলে যে সাফল্যের গতি বৃদ্ধি পায় সে কথাও স্মরণ রাখতে বলেছেন লেখক। শেষে বলেছেন, ‘মনে রাখা উচিত- এক তেলে চাকা ঘোরে আর-তেলে মন ফেরে।’

হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর ‘তৈল’ সমকালে চেতনা-জাগানিয়া রচনা হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে এবং উত্তরকালেও বিস্তৃত হয়েছে এর পরিপ্রেক্ষিত ও প্রাসঙ্গিকতা। হরপ্রসাদের চিন্তা-দরোজা এবং প্রকাশের ভার ও দক্ষতা পাঠককে সামান্য হলেও নতুন করে ভাবতে অনুপ্রাণিত করে। কেবল নিজে চিন্তাবিদের ভূমিকায় অবতীর্ণ থেকে নয়, আরও অনেককে চিন্তার ভুবনে আমন্ত্রণ জানিয়ে, বোধহয় সমাজ-পরিবর্তনের ডাক দিতে চেয়েছেন দার্শনিক হরপ্রসাদ। সমাজকে তিনি ধরতে চেয়েছেন মানুষের বিবেচনা ও প্রবণতার আলোয় এবং আড়ালের আলো-ছায়ায়। তাই তিনি মানুষের সামনে তুলে ধরেছেন মানুষেরই মানচিত্র।

মোঃ রায়হান খান
কম্পিউটার বিজ্ঞান ও প্রকৌশল বিভাগ (সিএসই)
নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়
ই-মেইল: raihankhancs@gmail.com